সকল পাঠক, পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই শুভ ইংরেজি নববর্ষের (২০২১) প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ত্রৈমাসিক

আনন্দ অঙ্গন

এই জায়গায় বিজ্ঞাপন দিন মাত্র ৩০০ টাকায় (প্রতি সংখ্যার জন্য)। ডিসপ্লে বিজ্ঞাপন (সাদা-কালো) প্রতি কলম সেমি ৫০ টাকা। প্রথম পাতার প্রতি কলম সেমি ৭৫ টাকা।

বর্ষ-৮, সংখ্যা-১, জানুয়ারি, ২০২১ AANANDA AANGAN মাঘ - ১৪২৭

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি'র শিল্পকর্ম ও জীবন কথা

নিখিলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইতালির রেনেসাঁস যুগের তিন সেরা শিল্পীর একজন হলেন লিওনার্দো দা ভিঞ্চি। তাঁর জন্ম হয়েছিল ফ্লোরেন্সের কাছে ছোটো এক স্থানে ১৪৫২ সালে। সে সময় ইতালির বিভিন্ন নগরীর মধ্যে ফ্লোরেন্স ছিল সবচেয়ে ধনী শহর। আর এই নগরীর শাসনভার ছিল মেডিচি পরিবারের হাতে। এই মেডিচি পরিবার মূর্তি আর ছবির খুব ভক্ত ছিলেন। বহু ভাস্কর, চিত্রশিল্পী এবং কারুশিল্পী সে আমলে এই রাজ পরিবারের সাহায্য পেয়ে ফ্লোরেন্সে বসবাস করত।

লিওনার্দোর বাবা পিয়েরো ছিলেন একজন আইন ব্যবসায়ী আর মা সহজ সরল গ্রামের মহিলা। বালক লিওনার্দোর মধ্যে চারপাশের প্রকৃতিকে জানার অদম্য কৌতূহল। তাই মাঝে মাঝেই সে পড়াশোনা ছেড়ে গ্রামের বনে জঙ্গলে, পথে ঘাটে ঘুরে বেড়াত আর তার দেখা সমস্ত বিষয়কে খুব মনোযোগ দিয়ে এঁকে রাখত নোটবুকে।

একদিন হল কী, গ্রামের একজন লোক লিওনার্দোর বাবার কাছে এসে একটা কাঠের ঢাল দিয়ে তার ওপর একটা নকশা করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করল। লিওনার্দোর বাবা ভাবলেন এটা আর এমন কী! এটা তো তার ছেলেই এঁকে দিতে পারবে। এই ভেবে তিনি ছেলেকে ডেকে ওই ঢালটাতে আঁকার দায়িত্ব দিলেন।

এদিকে ছেলের মাথায় এক অভিনব পরিকল্পনা খেলে গেল। বালক লিওনার্দো নকশাটার মধ্যে নানা জীবজন্তুর ছবি এঁকে সকলকে তাক লাগিয়ে দিতে চাইলেন। যেমনি ভাবা, তেমনি কাজ। মডেল হিসেবে কিশোর শিল্পী ধরে আনল বাদুড়, গিরগিটি, সাপ, ফড়িং আরও কত কী! তারপর নিজের ঘরে ওগুলোকে নিয়ে গিয়ে তাদের দেখে দেখে আঁকতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে বাবার শখ হল ছেলে কেমন আঁকছে তা দেখার। ঘরে গিয়ে এইসব সরীসৃপ দেখে তো আঁতকে উঠলেন ভয়ে। তবে ছবিটা দেখে মনে মনে খুশিই হলেন। তাঁর ছেলের যে ভবিষ্যতে বিরাট শিল্পী হওয়ার সম্ভাবনা আছে — এটা বুঝে ছেলেকে উৎসাহিতই করলেন।

১৪৬৬ সালে লিওনার্দোর পরিবার ফ্লোরেন্সে চলে এলেন। এবার তাঁকে পাঠানো হল আঁদ্রে ভেরোচিও নামে এক নিপুণ কলাশিক্ষকের স্টুডিওতে কাজ শেখার জন্য। তিরিশ বছর বয়সী এই শিক্ষক সোনা, রুপো, তামার ওপর মিনার কাজে অত্যন্ত কুশলী ছিলেন। এই একই শিক্ষকের কাছে ছবি আঁকা

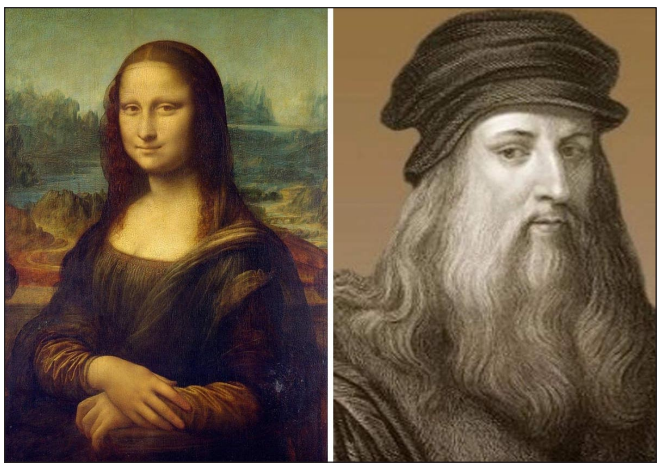

শিখে বতিচেল্লি ও পেরুজিনোও পরে নাম করেছিলেন। লিওনার্দো ছ'বছর আঁকা শিখলেন ভেরোচিওর কাছে। ধাতুর ওপর মিনার কাজ যেমন শেখাতেন তিনি, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে নানা মাধ্যমে ড্রয়িং আর রং দেওয়াও শেখাতেন।

লিওনার্দোর প্রথম যে আঁকাটির কথা জানতে পারা যায় তা হল, ভেরোচিওর আঁকা 'ব্যাপটিজম্ অব ক্রাইস্ট' ছবির বাঁদিতে একটি দেবদূত। গোটা ছবিটি এঁকেছিলেন ভেরোচিও। লিওনার্দো কেবল তার মধ্যে আঁকলেন ওই দেবদূতটুকু। কিন্তু ওই টুকুতেই এত সুন্দর রঙের প্রলেপ দিলেন যে তা দেখে গুরু ভেরোচিওই অভিভূত হয়ে পড়লেন। শোনা যায়, ভেরোচিও নাকি এরপর থেকে ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়ে মূর্তি তৈরিতেই নিজেকে ডুবিয়ে রাখতেন। তাঁর ভাবখানা ছিল, শিষ্যই যেখানে এত ভালো ছবি আঁকছে, সেখানে গুরু আর কী আঁকবে!

এরপর থেকে শিষ্যকে ভীষন ভালোবাসতেন ভেরোচিও। কাজ শেখা শেষ হলেও পরের কয়েকটা বছর লিওনার্দো ওনার বাড়িতেই রয়ে গেলেন। লিওনার্দোর পরবর্তী জীবনের কাজে একমাত্র এই ভেরোচিওর কাজেরই যা সামান্য ছাপ পাওয়া যায়।

১৪৭২ সালে একটি শিল্পী মণ্ডলীর সঙ্গে যোগ দিলেন তিনি। তখন তাঁর বাবা ছবির কাজ যাতে ভালোভাবে হয়, তার জন্য একটা স্টুডিয়ো ভাড়া করে দিলেন। এ সময় কুড়ি বছরের লিওনার্দো সুদর্শন যুবক। সোজা লম্বা চেহারা, কোঁকড়ানো সোনালি চুল। তবে তাঁর সঙ্গীসাথী বিশেষ ছিল না। অনুসন্ধানী মন নিয়ে সবসময় নিজের কাজের মধ্যে ডুবে থাকতেন। ভূগোল, অঙ্ক আর প্রাকৃতিক জগতের সব কিছুতেই তার ছিল দারুণ আগ্রহ।

তবে প্রথম জীবনে ফ্লোরেন্সে লিওনার্দো শিল্পী হিসেবে তেমন নাম করতে পারেন নি। যদিও কয়েকটা ছবির ফরমাশ নানাজনের কাছ থেকে পেয়েছিলেন, কিন্তু মেডিচি রাজ পরিবারের কাছে তেমন কোনও উৎসাহজনক সাহায্য পাননি, যেটা মাইকেল এঞ্জেলো পরে পেয়েছিলেন। তাই উৎসাহ হারিয়ে ১৪৮২ সালে ফ্লোরেন্স ছেড়ে মিলানে চলে গেলেন। যাওয়ার আগে অবশ্য তখনকার শাসক লরেঞ্জো ডি মেডিচির একটা পরিচয়পত্র আর চিঠি সংগ্রহ করে নিলেন, মিলানের ডিউক লুডোভিকো ইল মোরেকে দেওয়ার জন্য। লুডোভিকো তখন যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে ভীষণভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন, তাই মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার বলে নিজের পরিচয় দিলেন সেখানে। পরিচয়পত্রের সঙ্গে নানা ব্রিজ, মর্টার এবং যুদ্ধের অন্যান্য নানা অস্ত্রের নকশা এঁকে নিয়ে এসেছিলেন, সেগুলোকেও দেখালেন।

মিলানের রাজদরবার যেমন ক্ষমতাশালী ছিল, তেমনি ছিল ধনী। তবে শিল্পীদের সাহায্য আর উৎসাহ দেওয়ার অভ্যাস তাদের ছিল না। মূর্তি কিংবা ছবির কদরও তারা খুব করতো না। তাই লিওনার্দোকে শিল্পী হিসাবে না হলেও সংগীতজ্ঞ হিসেবে আর উৎসবের সংগঠন হিসাবে গ্রহণ করা হল মিলানের রাজদরবারে। লিওনার্দো নানা বিষয়ে ডিউকের উৎসাহ সৃষ্টির চেষ্টা করতে লাগলেন।

(ক্রমশ:)

সৌজন্যে : 'স্রষ্টা ও সৃষ্টি' গ্রন্থ

বাংলা চলচ্চিত্র ও সৌমিত্র

তুলসী সরকার

চলচ্চিত্রে এক যুগের অবসান। টালিগঞ্জের মহীরুহ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আর নেই।

উত্তম সমসাময়িক যুগেও বাঙালির মনের মণিকোঠায় জায়গা করে নিয়েছিলেন সৌমিত্র। ছয় দশকের দীর্ঘ তাঁর চলচ্চিত্র জীবন। অভিনয় ছিল তাঁর জীবনের অক্সিজেন, বলতেন, 'আমি অভিনয় করছি বলেই তো সুস্থ আছি।' তাই তো করোনা সতর্কতার মাঝেও লাইট-ক্যামেরা-অ্যাকশন থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন নি। লকডাউন পরবর্তী সময়ে শেষ করেছেন নিজের বায়োপিক অভিযান-এর শ্যুটিং। কাজ করেছেন একটি ডকুমেন্ট্রারি ফিল্মেও। সৌমিত্র বলতেন 'কাজ ছাড়া আমি আর কিচ্ছু করতে চাই না।'

১৯৩৫ সালে কৃষ্ণনগরে জন্ম সৌমিত্রবাবুর। বাবা মোহিত কুমার চট্টোপাধ্যায় কলকাতা হাইকোর্টের উকিল ছিলেন। তবে নাটকের চর্চা নিয়মিত ছিল পরিবারে, বাবা নাটকের দলে অভিনয় করতেন। ছোট থেকেই সেই পরিবেশে বড় হওয়া তাঁর। তখন থেকেই অভিনয়ের প্রেমে পড়ে যান সৌমিত্র। কলকাতার সিটি কলেজ থেকে প্রথমে আইএসসি এবং পরে বিএ অনার্স (বাংলা) পাশ করার পর পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজ অফ আর্টস-এ দু'বছর পড়াশোনা করেছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। অভিনেতার রুপোলি সফর শুরু হয়, ১৯৫৯ সালে। ছবির নাম অপুর সংসার, যা পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্র পরিচালক

এরপর ৩ পাতায়

জীবনচক্র

মনিশঙ্কর ব্যানার্জী

মানুষ ঠিক বুঝতে পারে না, কেন জীবনের চলার পথে, কখনো কখনো হঠাৎ কি রকম অনেক কিছু ওলটপালট হয়ে যায়? অবশ্য এর জন্যে তো আর শুধু প্রকৃতির সৃষ্টিকে দোষ দেওয়া যায় না। বাস্তবের ভারসাম্যতা বজায় রাখার পূর্ণ প্রচেষ্টায়, গন্ডগোল পাকিয়ে দেয় সময়ের পদক্ষেপ ও যৌবনতার আহ্বান। যৌবনের উদ্দীপনায় নেচে ওঠা হৃদয় সব কিছু পাকিয়ে দেয় গন্ডগোল।

আজকে প্রকৃতির লীলায় ভেসে ওঠা শিমূল ও কৃষ্ণচূড়ার লাল রং, অশোক ও পলাশের সৌন্দর্য অনেককেই হারিয়ে ফেলে অতীতের সেই দিনগুলোতে।

এরপর ৩ পাতায়

চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির

আনন্দ-অঙ্গন

সম্পাদকীয়

ইংরেজি নববর্ষ

নিশি অবসান, ওই পুরাতন বর্ষ হয় গত! মহাকালের অমোঘ নিয়মে ইতিহাসের পাতা থেকে বিদায় নিল আরেকটি বছর। শুরু হল ইংরেজি নতুন বর্ষ ২০২১। আনন্দ-বেদনা, সাফল্য-ব্যর্থতা, আশা-নিরাশা, প্রাপ্তি-প্রবঞ্চনার হিসেব-নিকেশ পেছনে ফেলে নতুন বছরকে স্বাগত জানাই আগামী দিনের নতুন স্বপ্নে সোনালি প্রত্যাশার পাখা মেলে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায়, 'বন্ধু হও, শত্রু হও, যেখানে যে কেহ রও,/ ক্ষমা করো আজিকার মতো,/ পুরাতন বর্ষের সাথে/ পুরাতন অপরাধ যত।' আমাদেরও প্রত্যাশা পুরনো বছরের যত ব্যর্থতা-বেদনা, হতাশা-নিরাশা এমনি করে ক্ষয় হোক আবর্ত আঘাতে।

পুরনো বছরের ভুলগুলো শুধরে সমস্ত ইতিহাস থেকে ভালো ভালো শিক্ষাগ্রহণ এবং অতীতের সফলতা-ব্যর্থতাকে পুনর্মূল্যায়ণের মাধ্যমে সুন্দর ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের লক্ষ্যে আমাদের সামনের দিকে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে হবে।

বাংলাদেশের মানুষ অর্থাৎ বাঙালি অন্যদের তুলনায় এই ভেবে অনায়াসে গর্ব করতে পারে যে, তাদের একটি নিজস্ব বর্ণমালা এবং একটি বর্ষপঞ্জি রয়েছে, যা বিশ্বের অনেক বিখ্যাত জাতিরও নেই। নিজস্ব বর্ষপঞ্জি থাকার কারণে বাঙালি বছরে দু'বার বর্ষবরণ করে, তার একটি পয়লা বৈশাখ। আরেকটি হলো ১লা জানুয়ারি। বাঙালি একবার বলে শুভ নববর্ষ। আরেকবার বলে হ্যাপি নিউ ইয়ার।

চিরসংগ্রামী, লড়াকু ও আশাবাদী মানুষের প্রত্যাশা সব ধরনের স্থবিরতা কাটিয়ে নতুন বছর সবার জীবনের বয়ে আনবে অনাবিল আনন্দ। এ দেশে ফিরে আসবে শান্তি, সমৃদ্ধি, স্বস্তি, গতিময়তা। নতুন আশার আলো প্লাবিত করবে দিক-দিগন্ত।

নতুনের প্রতি সবসময়ই মানুষের থাকে বিশেষ আগ্রহ ও উদ্দীপনা। নতুনের মধ্যে নিহিত থাকে অমিত সম্ভাবনা। সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়ণ করার সুযোগ করে দিতে এলো নতুন বছর।

মহাকালের অতলে হারিয়ে গেলো আরো একটি বছর। সময়ের চক্রে আর কখনোই ফিরবে না ২০২০ সাল। তবে বছরটির রেখে যাওয়া স্মৃতি-বিস্মৃতি আলোড়িত হবে প্রকৃতি-পরিবেশ-মনুষ্য সভ্যতায়। আজি নব-বর্ষ-প্রভাতে ভিক্ষা চাহি মার্জনা সবার। আবারও সবাইকে জানাই ইংরেজি নতুন বছরের প্রাণঢালা শুভেচ্ছা। শুভ হোক ইংরেজি নববর্ষ।

স্মরণে অর্ঘ্য

অরুণ কুমার চক্রবর্তী

আলতো পায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন পরিণত মানুষটি
হাতটা বাড়িয়ে দিলেন
এ দীর্ঘ পরবাসে সন্ধ্যে নামার আগে
ফিরে যেতে হবে যে সেখানে
তোমার প্রতীক্ষায় যুগ-যুগান্ত পার করে বসে
খেলাঘরের আসবাব সব সাজিয়ে তবে যে আমার ছুটি।

নিরঞ্জনকে বলেছিল পাণ্ডুলিপি এলোমেলা,
নতুন কবিরা যে এখনো প্রতীক্ষায়।
বৃদ্ধাশ্রমের মাপকাঠি সবাই মিলে একদিন
না হয় সরোজমিনে যাব।
হঠাৎ দেখা হবে পুকুরের ধারে
মাঝ ধরতে ধরতে, ফড়িংয়ের দল
হঠাৎ,
মনে পড়ে বিকেলের ওষুধ খাওয়ায় এখনো বাকি
তাই ফিরে চলে যাই
এই পোড়ামাটির ধূসর গন্ধ ছেড়ে।

হয়তো দেখা হবে
অ্যানড্রোমেডার গর্ভ স্থলে নামহীন এক ব্ল্যাকহোল-এ।

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদ

রঙের মিশ্রণ ও বস্তুর সঠিক রং নির্বাচন পদ্ধতি

ভারতীয় চিন্তাধারায় বা ভারতীয় পদ্ধতিতে ছবি আঁকতে হলে ছবিতে আলোছায়া অপেক্ষা রং-এর উজ্জ্বলতা বা সমন্বয় ইত্যাদি গুণগুলি ছবিতে প্রকাশ করতে হবে। তাই তাদের নিম্নলিখিত রং কয়েকটি দিয়ে ছবির বুনিয়াদ (ভিত) করে নিতে হবে।

যেমন--- (১) ইয়লো ওকার (এলা মাটি) কোন কোন গাছের শুকনো পাতায়, ফলের খোসায় এই রং দেখতে পাওয়া যায়। (২) লাইট রেড, (উজ্জ্বল গেরিমাটি)। (৩) টেরা ভারট (হরা পাথর বা সবুজ পাথর)। (৪) ইন্ডিগো। (৫) কালো। (৬) সাদা। রং-এর যে তালিকা দেওয়া হল পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ শিল্পীরাই এই রংগুলিকে সব চাইতে বেশি প্রয়োজনীয় বলে স্বীকার করেন এবং রেনাসাস যুগের পূর্ব পর্যন্ত এই রংগুলি পৃথিবীর সর্বত্র প্রচলিত ছিল। এই রং-এর বৈশিষ্ট এই যে, যেকোনো ভাবেই এগুলিকে মিশ্রণ করা যাক না কেন তা কোন রকমেই নোংরা দেখতে হয় না। অজন্তার সমস্ত ছবিই মোটামুটি এই রং-এ আঁকা বলা যেতে পারে।

রং মিশ্রণের কয়েকটি নিয়ম— দুটি গাঢ় রং ঠিক সমান অনুপাতে মেশালে রং প্রায়ই নোংরা হতে পারে। কিন্তু যদি অনুপাতের ইতর বিশেষ হয় (৩ : ১ - ৫ : ১) তবে নোংরা হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় থাকে না। উদাহরণ স্বরূপ — ব্রাউন ও কালো যদি সমান অনুপাতে মিশ্রণ করা হয় তা নোংরাই দেখতে হবে। অথচ বেশি পরিমাণে ব্রাউন আর অল্প কালো মিশে সুন্দর রং হবে। আবার নীল +সাদা = আকাশী, নীল+হলুদ= সবুজ, নীল+লাল = বেগুনি, খয়েরী+হলুদ = মেটে হলুদ, নীল +কালো = ভূষা কালো ইত্যাদি আরও তালিকা দেওয়া যেতে পারে। শিল্পী নিজে অনুসন্ধানে তা বুঝে নেবে।

দৃশ্য বস্তুটির সঠিক রং নির্বাচন করার জন্য কোন রংটি ঠিক কিরকম শেড হবে তা শিল্পীর খুব ভালভাবে জানা দরকার। প্রায় অনেকেই জানে না যে বার্ণট আম্বার আর লাইট রেডের ঠিক ঠিক পার্থক্য বা শেড কি। রেড, ওকার, ক্রিমসন ইত্যাদি ট্রান্সপারেন্ট অর্থাৎ পাতলা রংগুলি ভাল, এগুলির ভাল কেক রাখা উচিত। কেকের রং-এর সঙ্গে প্রকৃতির রং-এর সাদৃশ্য খুঁজে পাবার চেষ্টা করা উচিত। যেমন লিচুর বিচির রঙ, তরমুজের সবুজ, পাতার সবুজ রঙ গাঢ় পাতার লাল, আম পাতার লাল, এইরকম বৈচিত্র্যময় শেড আছে। সেইগুলি জানতে গেলে সঠিক রং নির্বাচন করতে হবে। এই সমস্ত আজকাল অনেকেই বিশ্বাস করে না কিন্তু এইগুলি আজ না হয় কাল শিখতেই হবে।

স্বামী বিবেকানন্দের অবদান

কার্ত্তিকচন্দ্র সরকার

উনবিংশ শতাব্দীর ভারতের সমাজব্যবস্থা ছিল অন্ধবিশ্বাস ও ধর্মীয় কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। জাতপাত, বর্ণ, ধর্মের বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল এদেশের সমাজ। যে গুটিকয়েক সমাজ সংস্কারকের প্রচেষ্টায় ভারতীয় সমাজ ধীরে ধীরে আধুনিক হয়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দের সমাজ ভাবনা:

স্বামীজী অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার ত্যাগ করে সকলকে যুক্তিবাদী হয়ে ওঠার কথা বলেন। স্বামীজীর স্বপ্ন ছিল সমাজে সকল শ্রেণিই একদিন একসূত্রে আবদ্ধ হবে। সমাজের দরিদ্র, অনুন্নত বা পিছিয়ে পড়া মানুষদের সামনের সারিতে নিয়ে আসার প্রয়োজন রয়েছে বলে তিনি মনে করতেন।

স্বামী বিবেকানন্দের জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা :

স্বামীজী জাতিভেদ প্রথার তীব্র নিন্দা করেন। তিনি ভারতবাসীকে জাতিভেদ প্রথা ত্যাগ করে ঐক্যবদ্ধ হয়ে উন্নতির জন্য উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেন। তিনি বলেন ভারতে ভবিষ্যতে আসবে শুদ্রের যুগ। শুদ্র — বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এক নতুন ভারত জন্ম নেবে। স্বামীজী বলেন '**নতুন ভারত বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে-মাল্লা-মুচি-মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে, বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে, বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে, বেরুক ঝোপ-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত থেকে।**'

দরিদ্র ভারতবাসীর সেবা :

বিবেকানন্দ বলেছেন, যথার্থ দেশসেবক হতে হলে দেশবাসীকে মনে প্রাণে, ভালোবাসতে হবে। আর এক্ষেত্রে সবার আগে দরিদ্র ভারতবাসীর সেবা করতে হবে। কারণ ধূলি ধূসরিত, ক্ষুধার্ত দেশবাসীর মুক্তি ছাড়া ভারতের উন্নতির সম্ভাবনা নেই। তাই দেশবাসীর প্রতি তিনি আহ্বান জানিয়ে বলেন, '**সদর্পে বল --- আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, বল --- মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।**'

নারী মুক্তির সমর্থক :

বিবেকানন্দ সমাজে নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য নারীমুক্তির গুরুত্ব অনুভব করেছিলেন। তিনি স্ত্রী শিক্ষার প্রসারকে সমর্থন করেন, কারণ তিনি মনে করেন মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে পড়লে তারা ভালোমন্দ বুঝতে শিখবে। তিনি বাল্য বিবাহেরও বিরোধী ছিলেন। তিনি কখনোই মনে করতেন না যে পাশ্চাত্য নারীরাই হল ভারতীয় নারীদের কাছে আদর্শ স্বরূপ। আমেরিকায় থাকাকালীন এক ভাষণে তিনি বলেছিলেন --- '**ভারতীয় বিধবারা যথেষ্ট কর্তৃত্বশালী ও মর্যাদার অধিকারী।**'

সামাজিক সাম্যের প্রচারক :

স্বামীজী বলেন, একচেটিয়া অধিকারের দিন শেষ হয়েছে। সকলের জন্য সমান ভোগ ও সমান অধিকারের ব্যবস্থা করতে হবে। অনুন্নতদের উন্নত করে সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তিনি আরও বলেন শিক্ষিত ব্যক্তিরা শিক্ষা দিয়ে ও ধনী ব্যক্তিরা ধন দিয়ে সেবা করলে সমাজের মঙ্গল হবে। স্বামীজী অনুন্নত শ্রেণির প্রতি বলেন কেবল উচ্চ শ্রেণির লোকেদের দোষ দিলে চলবে না। উন্নতির জন্য নিজেদেরও চেষ্টা করে যেতে হবে।

সাধারণের সুখ-দুঃখের শরিক :

স্বামীজী আসমুদ্র হিমালয় পরিভ্রমণ করে সাধারণ ভারতবাসীর সুখ দুঃখের শরিক হয়েছিলেন। ভারত পরিভ্রমণকালে তিনি ভারতীয় সমাজের দোষ, ত্রুটি, অন্যায়, অবিচারগুলি প্রত্যক্ষ করেন।

এরপর ৩ পাতায়

মেঘের সঙ্গী

জ্যোতির্ময় গোস্বামী

(প্রখ্যাত লেখক জ্যোতির্ময় গোস্বামীর 'সমাজযোগ' যা এখনও বই আকারে প্রকাশিত হয়নি। তবে আগামী দিনে হবে। বহুমুখী স্বরোজগার ও সর্বতোমুখী সবুজায়নে সার্বিক সমাজ যোগ।

সমবায় সাধনার ধারায় পরিবেশ, স্বরোজগার ও কৃষি সংকটের সমাধানে, ছোট একটি নয়া সংযোজন, সমাজের ত্রিবেণী সাধনা। সমাজযোগ কয়েকটি প্রবন্ধ সংকলনের সমন্বয়। এই সংকলনের প্রবন্ধগুলি এখন থেকে আনন্দ অঙ্গন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।)

প্লেন ছাড়ল যথা সময়ে। মানে ভোর রাতে। অসংখ্য যাত্রী। শুনলাম সংখ্যায় সাতশো। বেশির ভাগই ইউরোপীয়। দিল্লি বিমানবন্দরে তো এদের এহেন মাত্রায় দেখিনি। সিঙ্গাপুর থেকে এলো কি বিমানটা? নানা কটু কথা মনে হতে লাগলো। দিল্লির কথা স্বতন্ত্র। ভারতবর্ষের কোন শহরের আলাদা করে কী দেখাবার আছে যে, ঝাঁকে ঝাঁকে এতো বিদেশিকে এমন হৈহৈ করে ডেকে আনতে পারে?

রাত গড়াতে লাগলো। কিন্তু তার শেষ হবার রাস্তা বহু-বিলম্বিত। পশ্চিম দিকেই চলেছে যে। আমাদের ভারতে যকন সকাল সাতটা মতো হবে, প্লেনের জানলায় দেখলাম ভোরের আভাসের একটা যান্ত্রিক প্রদর্শনী হলো। দিন শুরুর ভাবটা যাত্রীদের মনে একবার ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। খানিক পরে সেটা মিলিয়েও গেলো। রাত কিন্তু গড়িয়ে চলল আরও তিন চার ঘণ্টা। রাতের এই গড়িয়ে চলাটা মন ঠিক নিতে পারে না। তাই ছেলে ভোলানো ভ্রমোৎপাদন। দিনের শুরু না হলেও, ঘোষণাটা তাই হৈ হৈ করে, করে-দেওয়া হলো।

মন তো ছেলে মানুষ-ই। তাকে ভোলাতে যদি এক-পৃথিবী আয়োজন করো, তবে সেই পরিমাণ ছেলেমানুষি দিয়েই তার মানানসই প্রত্যুত্তর দেবে! ছোট-বড়ো সব সৃজনকর্তার সৃষ্টির নজর তাই মানুষের এই নিহিত ছেলে-মানুষির দিকেই। 'আকাশ আমায় ভরল আলোয়, আকাশ আমি ভরব গানে' — সৃষ্টির এই দূর দিগন্ত পাড়ি দেওয়া দমও তো সেই মহা-ছেলেমানুষি থেকেই পাওয়া নাহলে 'জ্ঞান' নিশ্চয়ই আমাদের কবেই মহাস্থবির করে দিত বা 'মাটির দেহ হবে মাটি' বলে সব চেষ্টার সমাধি ঘটাতো কবেই একদিন।

যাই হোক, ভোরের আভাস পাওয়া গেল আমস্টারডামের স্থানীয় সময় সাড়ে আটটার কাছাকাছি। দিন ওদের এখনই এতোটাই ছোট হয়ে এসেছে। আকাশ মেঘলা হওয়ায় নামবার সময়েও নিচের দিকে দেখা গেল শুধু মেঘেরই সমুদ্র। আমরা যে মেঘেদের নাগালের অনেক ওপরে উঠে গিয়েছিলাম। আর মেঘেরা যে পৃথিবীর গায়েই প্রায় লেপ্টে থাকে! মেঘেদের এলাকায় নামতে না নামতে হুস করে আমস্টারডাম এসে গেল।

টরন্টোর উড়ান ধরতে দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়লাম। Alex lightwalkerএক জার্মান ছেলে। ভারতের ভক্ত। ভারতে আসতে চায়। ইসকনের সূত্রেই ভারতকে চেনে। কিন্তু ইসকনে যোগ দিতে আগ্রহী নয়। বলেছিল বন্দরে এসে দেখা করবে। কিন্তু বিরতির সময় মাত্র দেড় ঘণ্টা। বারণ করেছিলাম আসতে। ভেবেছিলাম নেমে একবার ফোন করল। কিন্তু তার অবকাশই পাওয়া গেল না। অতি তৎপর হয়ে টরেন্টোগামী বিমান ধরতে গিয়ে ছোট্ট একটু ভুল করলাম। ভুল সবটাই আমার নয়। টরন্টোর টার্মিনালে যাবার পথে এক সহপথিককে সঠিক দিশা জিজ্ঞেস করায় সে ছোট্ট একটু ভুল উত্তর দিল। তার জেরে ইমিগ্রেশনের লাইনে পড়লাম দাঁড়িয়ে। প্রায় কুড়ি মিনিট যাবার পর আমার সন্দেহ হতেই জানতে পারলাম ভুলটা। উল্টো পথ অতি সংকীর্ণ। কাজে কাজেই, অতি ভদ্রভাবে অতিবিগলিত বিনয়ে, কোনোরকমে লাইন থেকে উল্টো পথে বেরিয়েই একেবারে সোচ্চারে সাইরেন বাজিয়ে দিলাম : I am going to miss the Toronto flight।

সঙ্গে সঙ্গে একজন উদ্ধারকর্তা জুটে গেল। সে আবার দূরভাষযোগে মুহূর্তে জুটিয়ে দিল আর একজনকে। সে ঝটতি পৌঁছে দিল একেবারে সিকিউরিটি চেকআপের জায়গায়। সেখানে কিঞ্চিৎ খিটিমিটিতে জড়ানো গেল। তখন আর মাত্র মিনিট কুড়ি মতো হাতে সময়। বন্দরের ভেতরে ভেতরে বহু পথ অতিক্রম করতে তখনও বাকি। ঝুঁকি না নিয়ে আবার সাইরেন বাজিয়ে দিলাম। কারণ দীর্ঘপথের বাঁকে বাঁকে অনেক সময়ই কোনো জনমনিষ্যি দেখা যায় না। সিকিউরিটি সার্ভিসের কর্মীদের একজন একটু বলেটলে দিয়ে তার কাজে মন দিল। নির্দেশ মতো অনেকটা এগিয়ে গেছে। পথের বিভাজন দেখা দিলেই বুক দুরুদুরু করে ওঠে : এবার তবে কোন পথে যাই। ভগবান ছাড়া সঙ্গে কেউ নেই। বিমান ছাড়তে আর মিনিট দশেক মাত্র বাকি। ভুল পথে এগিয়ে গেলে বিপদের আর শেষ থাকবে না।

পিছনে দেখি এক সাহেব বাচ্চা আমার পিছু নিয়েছে। কিছু আগে একবার, মনে হচ্ছে, সে-ই বলেছিল, ঠিকই চলেছ, এগিয়ে চলো। সে নিজে চলছি কিন্তু দূরে দূরে। কিঞ্চিৎ অন্যমনস্কভাবে। মাঝেমাঝেই যখন কাতর চোখে জনমনুষ্যের সন্ধান করেছি, অনেক দূরে ঐ ছেলেটিকে দেখেছি। কিন্তু দীর্ঘপথে বরাবরই সে নাগালের বাইরে থেকেছে। পরে দেখি, অনেক কাছে এসে পড়ল। যেন আমাকেই গাইড করার জন্য নিযুক্ত সে। বিমানে চড়ার শেষ চেকআপের জায়গায় এসে প্রায় আমাকে চেপে ধরে আরকি।

আমারই রুমালে জড়ানো কতগুলো ডলারসহ আমার পাসপোর্টটা দেখিয়ে বলল, সেগুলো আমার কিনা। আমি তো থ। মনে পড়ল পাঁচটা-ছটা ট্রলারে আমার যাবতীয় সম্পত্তি চেকআপে দিয়েছিলাম। আমি যখন আমারই তাড়াহুড়ো ও ত্রুটির জন্যে লজ্জিত হয়ে পড়ছি, বাচ্চাটি দেখছি ওখানকার কর্মীদের গাফিলতির দিকে ইঙ্গিত করছে এবং আমার ডলার ক'টি ঠিক মতো আছে কিনা জানতে চাইছে।

চেকআপের সময় পকেটে কয়েন রাখা যায় না। তাছাড়া পার্সের মধ্যেও কটা কয়েন থাকায় তাড়াতাড়িতে গোটা পার্সটাই চেকআপের জন্য নামিয়ে দিয়েছিলাম। তাতে কাগুজে ডলারও কিছু ছিল।

ছেলেটির নাছোড় তৎপরতা দেখে মনে হলো, হাত সাফাইয়ের অভ্যাস এ অঞ্চলে অজানা নয়। আরও বুঝলাম, যেকোনো দুর্বৃত্তকে ঠেকানোর প্রক্রিয়াটাও তার থেকে কম জোরদার নয় এদের মধ্যে। আমার সব পয়সা ঠিক মতো আছে কিনা সে ব্যাপারে ছেলেটির সন্দেহের নিরসন করতে পারলাম না। তখন বিমান ধরার এতটাই তাড়া যে গোনবার অবকাশ নেই। বললাম, না গুণে বলতে পারবো না। দেখলাম, ছেলেটা বিমর্ষ হয়ে দৃশ্যতই নেতিয়ে পড়লো। সে কিছু একটা গন্ধ পেয়েছিল বোধহয়। একটা হেস্তনেস্তই চাইছিল যেন। সে হয়তো চাইছিল দরকার হলে বিমানের ওড়ান কিছুক্ষণ স্থগিত রেখে একটা এসপার-ওসপার এক্ষুনি হয়ে যাক। কিন্তু আমার মন তখন মহাসভার মহাভাবে ভরপুর। ছোট ব্যাপারে নিজেকে জড়াতে ঘোর গররাজি সে।

স্বামী বিবেকানন্দের অবদান

২ পাতার পর

পরিভ্রমণকালে ভারতীয় সমাজে রক্ষণশীলতা, জাতিভেদের সংকীর্ণতা, দারিদ্র্য, শোষণ সবকিছুই তার চোখে পড়ে। সাধারণ দরিদ্র ভারতবাসীর দুঃখমোচনের জন্য তিনি স্বাবলম্বী হওয়ার কথা বলেন।

যুব সমাজের অনুপ্রেরণা :

স্বামীজী ছিলেন যুব সমাজের কাছে আদর্শ। তিনি যুবকদের লৌহকঠিন পেশি, ইস্পাত কঠিন চরিত্র, বজ্রদীপ্ত মনের অধিকারী হয়ে ওঠার কথা বলেন। সকল সামাজিক সংকীর্ণতা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার আহ্বান জানান যুব সমাজের প্রতি। তিনি যুব সমাজের উদ্দেশ্যে বলেন, **'গীতা পাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলা ভালো।'** যুবকদের উদ্দেশ্যে স্বামীজী আরও বলেন, **'ওঠো, জাগো, নিজের প্রাপ্য বুঝে নাও।'**

রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজসেবা :

সমাজ কল্যাণের আদর্শকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য স্বামীজী প্রতিষ্ঠা করেন রামকৃষ্ণ মিশন (১৮৯৭ খ্রি. ১ মে)। এই মিশনের বহু উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্যতম হল জাতি, বর্ণ, নির্বিশেষে দুঃস্থ মানুষদের সেবা করা। আজও নির্যাতিত, অবহেলিত, শোষিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো ও তাদের দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করার ব্রত পালন করে চলেছে রামকৃষ্ণ মিশন।

মূল্যায়ণ :

স্বামীজী মনে প্রাণে চেয়েছিলেন এক গোঁড়ামিমুক্ত, কুসংস্কারমুক্ত ও জাতপাতহীন সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠুক। এই সমাজের পরিচালিকা শক্তি হোক শূদ্র বা আধুনিক পরিভাষায় প্রলেতারিয়েতগণ। সমাজ সংস্কারকদের প্রতি তাঁর সাবধান বাণী ছিল, **'সামাজিক ব্যাধির প্রতিকার বাহিরের চেষ্টা দ্বারা হইবে না, মনের উপর কার্য করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।'**

জীবনচক্র

১ পাতার পর

মনে পড়ে যায় পুরনো দিনের সেই গানের পংক্তিগুলো — 'ও শিমূল বন দাও রাঙিয়ে মন, কৃষ্ণচূড়া দোপাটি আর পলাশ দিলো ডাক, মধুর লোভে ভীড় জমালো মৌ পিয়াসী অলির ঝাঁক।'

যৌবনের প্রথম পদক্ষেপের বহু দুষ্টুমি মনে করিয়ে দেয়। স্মৃতিগুলো যেন হাতছানি দিয়ে নিয়ে যায় পুরনো সেই দিনগুলোয়। আমাদের বার্ধক্য ফিরে পেতে চায় ফেলে আসা যৌবনকে। এটাই তো প্রকৃতির খেলা।

মনে পড়ে যায় সেই সুন্দর ইংরাজি পংক্তি 'উই আর নট সিনিয়র সিটিজেন্স, উই আর রি-সাইকেলড টিন এজার্স'। কিন্তু বাস্তব যে বড় কঠিন —

বাস্তবের বাস্তবতায় বিরাজ করে অপরিসীম আনন্দ, যে দুঃখের মাঝেও নিজের ভান্ডার খুলে দেয়। গড়ে তোলে আমাদের মন্দিররূপী সংসার। যেখানে সুখ দুঃখ গলা জড়াজড়ি করে মান ও হুঁশের সংমিশ্রণ এর মধ্যে দিয়ে আমাদের দায়িত্ববান মা.....নু.....ষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে।

আমরা আজ উপভোগ করি কৃষ্ণচূড়া ও পলাশের সৌন্দর্য, শুধু উপভোগের পরিধিটা, মানেটা পাল্টে গেছে। শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্য এর প্রাচুর্য উপভোগ করে, নিজেদের জীবনকে সার্থক করে তোলার চেষ্টার মাঝে, নিজের ও পরস্পরের জীবনের আলো আঁধারীর অনুভূতির মধ্য দিয়ে, খুঁজে নিয়ে আসা সেই হারিয়ে যাওয়া আনন্দের মুহূর্তগুলো।

এটাই স্রষ্টার সৃষ্টি, এটাই ধ্রুব সত্য ও এর নামই জীবনচক্র।

বাংলা চলচ্চিত্র ও সৌমিত্র

১ পাতার পর

সত্যজিৎ রায়। সেই পথচলা শুরু এই জুটির। সত্যজিৎ পরিচালিত ৩৪টি ছবির ১৪টি ছবিতে অভিনয় করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, যা বাংলা চলচ্চিত্রের পরম ও বিরল প্রাপ্তি। তবে শুধু সত্যজিৎ রায় নন, তপন সিনহা, মৃণাল সেন, অজয় কর, তরুণ মজুমদার থেকে শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-নন্দিতা রায়, সৃজিত মুখোপাধ্যায়, অতনু ঘোষ, সুমন ঘোষের মতো আজকের প্রজন্মের পরিচালকদের ছবিতে অভিনয় করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। ৬১ বছরের দীর্ঘ ফিল্মি কেরিয়ারে প্রায় ৩০০টি ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি।

পাশাপাশি মঞ্চাভিনয়, নাট্য পরিচালনা ও নাট্য রচনাতেও তিনি সফল হন। আজীবন তাঁর এই মঞ্চপ্রীতি বজায় ছিল। নাটক নিয়ে নিত্যনতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতেও বিশেষ দক্ষ ছিলেন নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ীর অনুসারী এই অভিনেতা। আবার সাহিত্য জগত্যে ছিল তাঁর অনায়াস পদচারণ। তাঁর এ যাবৎ প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ডজন ছাপিয়ে গিয়েছে। ছবি আঁকাতেও প্রবল আগ্রহ ছিল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের। তবে যতদিন বাংলা সিনেমা থাকবে, বাঙালি থাকবে, ততদিন বাঙালির মনে চিরকাল বেঁচে থাকবেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

মোনালিসা আর্ট স্কুল

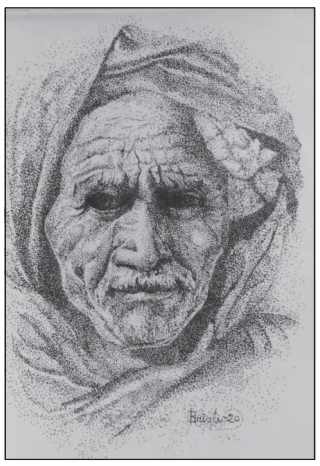

বৃষ্টি দেবনাথ

শিল্পকলা আর্ট স্কুল

দীপ মজুমদার

দি চিল্লিয় আর্ট স্কুল

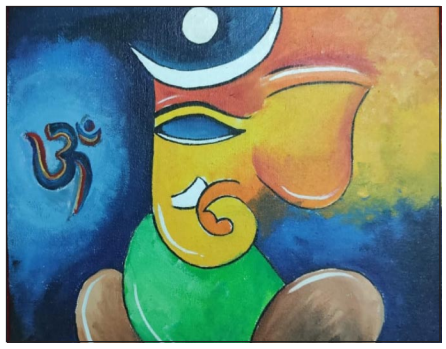

ত্রিদিপ দাস

শিল্পের আঙিনায় রবীন্দ্রনাথ ও পরবর্তী সময়

অরুণ কুমার চক্রবর্তী

গত সংখ্যার পর

গোড়া থেকেই সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ সঙ্গে গান লেখা, সুর করা এবং নাটক, যা পরবর্তীকালে তিনি অভিনয় করে দেখাতেন। লেখার সঙ্গে সঙ্গে আঁকিবুঁকি করার এ সফল প্রয়োগ ঘটাতে থাকেন, যা পরবর্তীকালে এক অসামান্য চিত্রধরার উপহার আমরা ওই ছবিগুলির মধ্যে থেকে পাই। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন শিল্পকলা ছাড়া কোনো শিক্ষাই সম্পূর্ণ নয়।

১৯১৮ সালে কলা ভবনের প্রতিষ্ঠার পর তার দায়িত্বভার তুলে দেন শিল্পী নন্দলাল বসুর হাতে।

১৯২১ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনের ভারতবর্ষে প্রথম শিল্পকলা শিক্ষা শুরু হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)/(১৮৮৩-১৯৬৬) যৌথ উদোগে গড়ে ওঠে এক শিল্প আন্দোলন। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় (১৯০৪-১৯৮০) ও রামকিঙ্কর বেইজ (১৯১০-১৯৮০) ছিলেন নন্দলালের দুই অত্যন্ত প্রতিভা সম্পন্ন শিষ্য।

যে সময় কলাভবন আত্মপ্রকাশ করে ভারতীয় শিল্পকলার ততদিনে যথেষ্ট উন্মেষ ঘটে গেছে। তবু তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কোন বিশেষ সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান ছিল না।

চল্লিশের দশকে যখন কলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজে বিভিন্ন শিল্পীরা কাজ করছেন শিল্পের আধুনিকতা ও সমকালীন বাস্তবতা নিয়ে, তখন বিনোদ বিহারী ও রামকিঙ্করের কাজের মধ্যে আমরা পাই তারই এক অন্য উত্তরণ। আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর লেখা ও শিল্পকলার প্রতি তাঁর অনুরাগ শিল্পীদের আকৃষ্ট করে। ওঁর ভাবনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলা। রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় যে দর্শন প্রতিফলিত হয় তা এক সৌন্দর্য প্রেম। যার পরিশেষে আমরা পাই এক পরিণত শিল্পীকে। শিল্পী রবীন্দ্রনাথকে আমরা পাই ১৯২০ সাল থেকে যদিও তার শিল্পী মন-এর সন্ধান আমরা পেয়েছি ১৮৯৩ সালের একটি পত্রে, শিলাইদহ থেকে লেখা। (সমাপ্ত)

আলোর পথে

শমী তরফদার

সতত সুখ স্বপ্নের জাল বুনি
নিয়ত বিষ বৃক্ষের চারা করি রোপণ।
এগিয়ে চলার কথা বলি মুখে
হৃদয়ে রাখি স্বযতনে অন্ধকার কে ঢেকে।
এখন মীরা কৃষ্ণ প্রেমে পথে ঘাটে মাঠে
রাইকিশোরী এখনও সেই কলঙ্কিনী বটে।
যুগ থেকে যাই যুগান্তরে অন্য অন্য মনে
বনফুলের ঠাঁই মেলে না গোলাপের বনে।
পণ্য কেবল পণ্য রই হাতে হাতে ঘুরে
মনের মতো দাম দিলনা এমন মধুপুরে।
কেনাবেচার অনেকরকম কত গলিপথ
আমার তো সেই অপেক্ষা আসবে স্বর্নরথ।
আসি ধরায় ছড়িয়ে দিয়ে অমৃতের বীজ
মেতে উঠুক এই খুশিতে লাগুক নব সাজ।
রাশি রাশি ফুটুক ফুল, ঝরে পড়ুক সুর দল
দিকে দিকে আলোকিত আঁধার হোক দূর।

গোল্লাছুট ও ছেলেটা

অনুপ মণ্ডল

স্বপ্নের ঘুড়িটা -
উড়ে গেছে — নীল দিগন্তে
শুধু শুধু লাটাই হাতে
ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে
দেখছে - সাদা মেঘগুলিকে
সে ভাবছে — আমিও যদি
মেঘের দলে মিশে যেতাম
ওদের সাথে খেলতাম
ছোট্ট বেলার — গোল্লাছুট
গোল্লাছুট খেলাটা
কেমন করে হারিয়ে গেলো
ইন্টারনেটের যুগে —
ও খেলা আজ মানায় না
তাই সে এখন — বাদের দলে।

শ্রদ্ধার্ঘ্য

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৫ তম জন্মজয়ন্তী

রেখা চিত্রম

অমিত মন্ডল

দেবযানী পাল

গীতাঞ্জলি কালচারাল ইনস্টিটিউট

ইরফান মোল্লা

বিদিশা প্রামাণিক

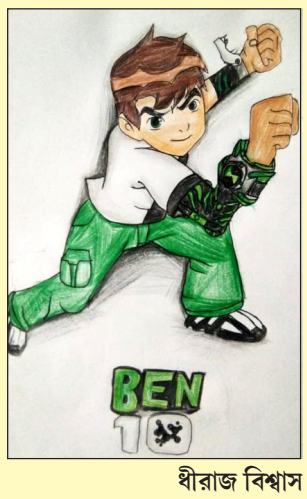

ধীরাজ বিশ্বাস

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদ

ঘোলা (সি ব্লক), প্লট নং- ৭২১, সোদপুর, কলকাতা-৭০০ ১১০
যোগাযোগ ঃ 8617847889/9382831611/ 9874566708/8910739009
Email : shilpakalaparishad@gmail.com
Whatsapp: 8617847889/9874566708

ব্রাঞ্চ অফিস ঃ এন. পি. এ-৩৫৫, নজরুল পল্লী, ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা-১০২, যোগাযোগ ঃ ৯৮৭৪৫৬৬৭০৮
Facebook : sarbabharatiya shilpakala parishad

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদ

বর্তমানে সারা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় থাকা চিত্রশিল্পী, অঙ্কন শিক্ষক, শিক্ষিকার দ্বারা প্রশংসিত। এই প্রতিষ্ঠান শিল্পীর শৈল্পিক স্বপ্নকে জাগিয়ে তুলবে সৃষ্টির প্রেরণার মাধ্যমে।

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদের শিল্প সমৃদ্ধ পাঠাগার, শিল্পকলা ও অঙ্কন শিল্পীদের অধ্যয়ন এবং গবেষণা ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

কার্ত্তিক চন্দ্র সরকার কর্তৃক এন. পি. এ-৩৫৫, নজরুল পল্লী, ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা-১০২ হইতে প্রকাশিত ও মুদ্রিত। যোগাযোগ ঃ ৯৮৭৪৫৬৬৭০৮ (মোঃ ও হোয়াটস্অ্যাপ), ৮৯১০৭৩৯০০৯। সম্পাদক ঃ কার্ত্তিক চন্দ্র সরকার।E-mail : k.sarkar151071@gmail.com